মালকানগিরিতে গণহত্যা

একটি তদন্তমূলক প্রতিবেদন

গত চব্বিশে অক্টোবর দুপুরে সবক'টি নিউজ চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ ঝলসে উঠল, ওড়িশার মালকানগিরিতে চব্বিশ জন মাওবাদী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত! পরদিন দেখি, খবরের কাগজেও বড় বড় করে ছেপেছে। তার পরেই কমিটি ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস অর্গানাইজেশন (সিডিআরও) স্থির করে, প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য ওই অঞ্চলে একটি তদন্তকারী টিম পাঠাবে। কলকাতা থেকে এপিডিআরের তাপস চক্রবর্তী আমাকে ফোন করে বললেন, যাবেন নাকি আমি রাজি, টিকিটও কনফার্ম হয়ে গেল। তাপসবাবুই টিকিট কেটে দিয়েছেন। কিন্তু বাধা এল অন্য দিক থেকে। বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোনের প্রভাবে ওড়িশায় প্রবল দুর্যোগ। তখন ওই অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব টিকিট ক্যানসেল। পরে শুনলাম, আমরা ওই সময় গেলেও অকুস্থলে ঢুকতে পারতাম না। কারণ একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত সেখানে গ্রেহাউন্ড বাহিনী মোতায়েন ছিল। বহিরাগতদের তারা কখনই ঢুকতে দিত না।

দুর্যোগ কমার পরে আমরা চারজন চৌঠা নভেম্বর হাওড়া থেকে বিশাখাপত্তমের উদ্দেশে রওনা হই। এবারও তাপসবাবু টিকিট কেটে দিয়েছেন। বিশাখাপত্তনম থেকে আমাদের মালকানগিরিতে ঢোকার কথা। আমি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-এর পক্ষ থেকে গিয়েছিলাম। বন্দিমুক্তি কমিটির পক্ষে গিয়েছেন ছোটন দাস ও ভানু সরকার, কমিটি ফর রিলিজ অব পলিটিক্যাল প্রিজনার্স (সিআরপিপি)-র পক্ষ থেকে গিয়েছিলেন সন্দীপ সাহা।

আমরা পাঁচই নভেম্বর বেলা ন'টা নাগাদ বিশাখাপত্তনমে পৌঁছই। সেখানে নানা রাজ্যের মানবাধিকার সংগঠন থেকে প্রায় চল্লিশ জনের উপস্থিত হওয়ার কথা। তাঁরা সকলেই তথ্যানুসন্ধানে যাবেন। যেখানে গ্রে হাউন্ডরা হানা দিয়েছিল, তা অতি দুর্গম অরণ্যময় স্থান। ওই অঞ্চলটি ওড়িশার অন্তর্গত হলেও অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম দিয়েই সেখানে যাওয়া সহজতর। বিশাখাপত্তনম থেকে সড়কপথে দুই-আড়াইশ কিলোমিটার দূরে যেতে হবে।

বিশাখাপত্তনম গিয়ে শুনি, তথ্যানুসন্ধানীদের একটি দল ঘণ্টা দু'য়েক আগে চারটি গাড়িতে চড়ে রওনা হয়েছে। আমরা বেলা পৌনে দশটা নাগাদ গাড়িতে মালকানগিরির দিকে রওনা হই। আমরা চারজন বাদে স্থানীয় এক গাইড ছিলেন। তাঁর সাহায্য ব্যতীত ওই অঞ্চলে পৌঁছানো সম্ভবপর নয়। মাঝপথে আরও একজন আমাদের গাড়িতে উঠলেন। তিনি স্থানীয় এক মানবাধিকার সংগঠনের কর্মী।

বিশাখাপত্তনম স্টেশন থেকে রওনা হওয়ার একঘণ্টা পরে গাড়ি বনের মধ্যে ঢুকল। তবে তখনও বন তেমন ঘন নয়। তার মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি। সেখানে চাষবাস হয়। ওই এলাকা অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত। যত এগচ্ছি, বন তত ঘন হচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে পিচবাঁধানো রাস্তা।

ঘণ্টাচারেক যাওয়ার পরে একটা নাম না জানা জায়গায় গাড়ি থামল। সেখানে দু'-একটা দোকানপাট আছে।

এখান থেকে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা রাস্তা গেছে সোজা। আর একটা সরু রাস্তা বেঁকে গেছে বাঁদিকে। আমরা ওই পথ ধরে যাব। আমাদের আগের গাড়িগুলি পথ ভুল করে চলে গেছে সোজা রাস্তায়। আমাদের গাইড তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। খানিক বাদে গাড়িগুলি ফিরে এল। এই প্রথমবার আমরা তথ্যানুসন্ধানী দলের সকলে এক জায়গায় মিলিত হলাম।

এসব জায়গায় রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা। তার উপরে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। সেই পথ দিয়ে ঘণ্টা দেড়েক যাওয়ার পরে গাড়ি থামল। ওই জায়গার নাম কুমাদা। পথের ধারে দেখলাম একটা মুদিখানা। চা-বিস্কুটও পাওয়া যায়। আমরা কয়েক প্যাকেট বিস্কুটও কিনলাম। পথে কখন কী জুটবে ঠিক নেই। তখন বিকাল চারটে।

ক্রমশ পথ আরও দুর্গম হয়ে উঠছে। আমাদের গাড়িগুলি ওই পথে যেতে পারবে না। সেগুলি বিদায় করে দেওয়া হল। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠনের সদস্যরা আমাদের জন্য কম্যান্ডো জিপের ব্যবস্থা করেছেন। এইবার ওই গাড়িতে চড়ে যেতে হবে।

আরও ঘণ্টাদু'য়েক যাওয়ার পরে অন্ধ্রের সীমানা শেষ। অন্ধ্রের শেষ গ্রামের নাম মুনচাঙ্গিপুর। তার পরের গ্রাম মুক্কুগুড়া। ওই হল ওড়িশার শুরু।

ওড়িশায় ঢোকার কিছুক্ষণ পরে বনের পথে ঝপ করে নামল হেমন্তের সন্ধ্যা। ততক্ষণে আমরা পৌঁছেছি বেজিঙ্গি গ্রামে। পথের পাশে একটা বাড়িতে রাতে থাকার ব্যবস্থা। ইটের বাড়ি, মাথায় অ্যাসবেস্টসের চাল। গৃহকর্তা অতি সহৃদয় ব্যক্তি। আমরা তথ্যানুসন্ধানী দলের সদস্য শুনে থাকতে দিয়েছেন। আমাদের জন্য রান্নাও চাপালেন। সেইখানে আমাদের একটা ছোটখাটো মিটিং হচ্ছে। মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের আলোচনা, মত বিনিময়। পাঞ্জাবের মানবাধিকার সংগঠনের এক কর্মী গিয়েছিলেন, তিনি বললেন, যদি অকুস্থলে গিয়ে দেখি এনকাউন্টার হয়েছিল, অর্থাৎ উভয়পক্ষে গুলির যুদ্ধ হয়েছে, তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি দেখি, গ্রেহাউন্ড একতরফা গুলি চালিয়ে মাওবাদীদের হত্যা করেছে, অর্থাৎ ফেক এনকাউন্টার, তা হলে অবশ্যই প্রতিবাদ করতে হবে।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর শেষাইয়া। ওই মন্তব্যে তাঁর ঘোর আপত্তি। তিনি বললেন, সরকারকে আগে স্পষ্ট বলতে হবে, এটা কী যুদ্ধ হচ্ছে? যদি রাষ্ট্র বনাম মাওবাদীদের যুদ্ধ হয়, তা হলে যুদ্ধের আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মানতে হবে। আর রাষ্ট্র যদি বলে মাওবাদীরা আইনশৃঙ্খলার সমস্যা, তা হলে প্রশ্ন উঠবে, এতগুলি লোককে হত্যা করা হল কেন? তাদের কি গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হয়েছিল? আইনশৃঙ্খলার সমস্যায় আধা সেনাই বা মোতায়েন করা হয়েছে কেন?

প্রফেসর শেষাইয়া চমৎকার বলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদের অবস্থান ও ইতিকর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। মিটিংয়ের পরে আমি শুয়ে পড়েছি। মাঝরাতে ঘুম ভাঙল প্রবল শীতে। মাটির মেঝে থেকে কনকনে হিম উঠছে। গায়ে যে চাদরটা ছিল, মনে হচ্ছে কেউ জলে ভিজিয়ে দিয়েছে, এমন ঠান্ডা। ততক্ষণে বাকিদের খাওয়া দাওয়া সারা। আমাকেও জাগানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তাই তারা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি যে বিস্কুটগুলো কিনেছি, সেগুলো এবার কাজে লাগল।

পরদিন ভোর ছ'টা নাগাদ ফের যাত্রা শুরু। আমাদের দল দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদল যাবে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। অপর দলটি যাবে অকুস্থলে। যারা নিহতদের বাড়িতে যাচ্ছে, তারা কম্যান্ডো জিপে চড়েই যেতে পারবে। কিন্তু যে গ্রামের কাছে গুলি চলেছে, সেখানে জিপও যেতে পারে না।

আমি গ্রামে গিয়েছিলাম। আমাদের জন্য এল ট্রাকটর। ওই হল এখানকার বাহন। একটা ট্রাকটরে পঁচিশ জন উঠেছি। অতজনকে নিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে গাড়ি যাচ্ছে, এক একটা উঁচু বোল্ডারে উঠতে গিয়ে পিছিয়ে আসছে খানিকদূর। তারপর গোঁ গোঁ করে ফের উঠছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এই বুঝি গেল উল্টে। ওইভাবে গেল দশ কিলোমিটার। তারপর ট্রাকটরও ফেল। গাইড বললেন, এবার হেঁটে যেতে হবে। সে প্রায় দু'কিলোমিটার পথ।

ছ'ই নভেম্বর বেলা দশটা নাগাদ আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। গ্রামের নাম রামগুড়া। গুমা ব্লক, থানা চিত্রকোণ্ডা, জেলা মালকানগিরি। গ্রামে মাত্র তিরিশটি পরিবারের বাস, জনসংখ্যা বড় জোর দু'শ। গ্রাম থেকে নিকটতম থানা পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে। জেলা সদরের দূরত্ব পঁচাশি থেকে নব্বই কিলোমিটার। গ্রামের পাশে বিশাল জলাধার। তার নাম বালিমেলা। গোদাবরীর এক শাখানদী সিলেরু, তার জল ওইখানে সঞ্চিত থাকে। তার জলধারণ ক্ষমতা তিনশ একষট্টি কোটি কিউবিক মিটার। জলাধারের মধ্যে মধ্যে উঁচু হয়ে আছে পাহাড়। জলাধারের অপর প্রান্তে সবুজে ঢাকা বোন্ডা পর্বতমালা। সেখানে বোন্ডা, ডিডয়, কুবি, প্রজা, দরা, রানা ও গৌর উপজাতির বাস। আবহমান কাল ধরে তারা হতদরিদ্র। বোন্ডাদের পুরাণে আছে, ত্রেতাযুগে একবার রাম আর সীতা এসেছিলেন বোন্ডা ভূমিতে। তখন স্থানীয় লোকজন নাকি পুষ্করিণীতে স্নানরত সীতাদেবীকে দেখে বিদ্রূপ করেছিল। তখন সীতাদেবী তাদের অভিশাপ দেন। তাতেই এই দুর্দশা।

এ তো বোন্ডাদের পুরাণকাহিনী। তাদের উপরে না হয় সীতার অভিশাপ আছে, কিন্তু বাকি উপজাতিগুলিরও এত দুর্দশা কেন্ন ওখানে সবচেয়ে গরিব দু'টি উপজাতি হল ডিডয় আর কুবি। তারা এখনও রামসীতার আমলে রয়ে গেছে। মূলত মাছ ধরে আর অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করে তাদের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয়। এখানকার জমি রুক্ষ পাথুরে। সামান্যই চাষবাস হয়। মূলত ভুট্টা আর ধানের চাষ। সেই ফসল জমিয়ে রেখে সারা বছরের খাদ্য। বাঁশ, আম, কাঁঠাল আর তেঁতুল গাছ অনেক দেখলাম, আরও অনেক নাম না জানা গাছ। আমগাছগুলো যেমন উঁচু, তেমনি মোটা তাদের গুঁড়ি, একটা মানুষ দু'হাত দিয়ে ধরতে পারবে না। তবে তার আম খাওয়া যায় না, এমন টক।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় নেই। অনেক দূরে একটা হাট বসে প্রতি রবিবারে, জায়গাটার নাম পানসপুট। রামগুড়া গ্রাম থেকে হেঁটে ছ'ঘণ্টার পথ। আসতেও ছ'ঘণ্টা। ওইখানে পুরানো জামাকাপড় বিক্রি হয়। গ্রামের লোকেরা কিনে আনে। এখানকার মানুষ কখনও নতুন জামাকাপড় পরেনি। গ্রামের কোনও শিশু পড়াশোনা করে না। প্রাথমিক স্কুলও নেই। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে বহু দূরে। সেখানে কোনও ডাক্তারবাবু যায় না। ম্যালেরিয়া আর ডায়রিয়া, এই দু'টি রোগ খুব হয়, সাপেও কামড়ায় অনেককে, কিন্তু তাদের বাঁচানোর জন্য সরকারের মাথাব্যথা নেই।

গ্রাম থেকে কিছু দূরে দরলাবেড়া নামে আর একটা হাট আছে। প্রতি শনিবার জোরামগ্রাম বলে একটা জায়গায় বসে। বালিমেলা জলাধার পেরিয়ে যেতে হয়। সেও চার ঘণ্টার পথ।

সম্ভবত আটের দশক থেকে ওখানে মাওবাদীদের আনাগোনা শুরু। দু'হাজার চার সাল নাগাদ তাদের সংগঠন বেশ শক্তপোক্ত। তারাই স্থানীয় মানুষকে বুঝিয়েছে, সীতার অভিশাপ নয়, তোমাদের দুর্গতির জন্য দায়ী রাষ্ট্র ও তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখন স্থানীয় লোকজন কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

আমরা রামগুড়া গ্রামে যেতে কিছু লোক জড়ো হয়েছে। তারা বলল, এখানে সরকারের কোনও প্রতিনিধি আসে না। এখানকার মানুষের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা বাসস্থান নিয়ে সরকার কখনও মাথা ঘামায়নি। তারা বাঁচল কি মরল, তাতে সরকারি বাবুদের কিছু যায় আসে না।

ওইসব গ্রামে প্রথমবার সরকারের যে লোকেরা এল, তারা গ্রেহাউন্ড বাহিনীর সদস্য। জংলা ছাপের জামা-প্যান্ট পরা গাঁট্টাগোট্টা জওয়ান সব, হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, তা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরয়। ওইরকম অস্ত্র দিয়ে পুরো গ্রামকে শেষ করে ফেলতে লাগবে বড় জোর এক ঘণ্টা।

গ্রে হাউন্ড একরকম বিলিতি কুকুরের নাম। তারা খুব হিংস্র প্রকৃতির, শিকারে কাজে লাগে। মাওবাদীদের মারার জন্য সরকার যে বাহিনী বানিয়েছে, তার নাম দিয়েছে গ্রেহাউন্ড। ঊনিশশ ঊননব্বই সালে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথমবার তৈরি হয়েছিল। পরে অন্যান্য নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যে তৈরি হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সবচেয়ে দক্ষ কর্মীদের তাতে নিয়োগ করা হয়। তাদের নকশাল দমনের জন্য বিশেষ ট্রেনিংও দেয়। ওই বাহিনীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে অনুদানও দিয়ে থাকে। দু'হাজার তের সালে চারটি রাজ্যকে গ্রেহাউন্ড পুষতে দিয়েছিল দু'শ আশি কোটি টাকা।

রামগুড়া গ্রামের লোকেরা বলল, মাওবাদীদের মারতে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পুলিশ এসেছিল। আমরা ওড়িশায় বাস করি, কিন্তু এখানকার পুলিশ আসনি। গ্রেহাউন্ডরা যদি মাওবাদীদের মেরে ফেলে আমাদের কে দেখবে্ন

আমরা প্রশ্ন করলাম, মাওবাদীরা আপনাদের কীভাবে দেখাশোনা করে। গ্রামবাসীরা বলল, এখানে মাওবাদীরাই প্রথমবার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। এখন কাউকে সাপে কামড়ালে ওরা প্রথমে অ্যান্টি ভেনম ইঞ্জেকশন দেয়। কারও ম্যালেরিয়া আর ডায়রিয়া হলেও ওষুধ দেয়। তারপর পাঠিয়ে দেয় হাসপাতালে। সেই হাসপাতাল বহু দূরে। আগে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পথেই বেশিরভাগ লোক মারা যেত। এখন ওইসব মৃত্যু প্রায় পঁচানব্বই শতাংশ ঠেকানো গেছে। এখন মাওবাদীদের মারার জন্য শহর থেকে পুলিশ আসছে। ওরা মরে গেলে আমাদের বাঁচানোর জন্য শহর থেকে ডাক্তার আসবে তো্ন

শুধু চিকিৎসা নয়, মাওবাদীরা এসে আমাদের চাষবাস শিখিয়েছে। আদিম অরণ্যভূমিকে সুজলা সুফলা করে তোলার জন্য তারা প্রথমদিকে চেক ড্যাম বানিয়েছিল। চেক ড্যাম কাকে বল্লো পাহাড় থেকে যেসব ঝরনা নেমে এসেছে, তার জলকে সংরক্ষণের জন্য একপ্রকার ছোট ছোট বাঁধ দিতে হয়। তাকে বলে চেক ড্যাম। তা থেকে জলসেচের ব্যবস্থা। গ্রামে গ্রামে ওইরকম বাঁধ আছে।

মাওবাদীদের সহযোগিতায় গ্রামবাসীরা ওইভাবে কয়েকশ একর জমিকে চাষযোগ্য করে তুলেছে। স্থানীয় লোকজন জমি পেয়েছে।

মাওবাদীরা তাদের হলুদ, কাজু, পেয়ারা, আমলকি, লেবু, কলা ইত্যাদির বীজ দিয়েছে। হাল, বলদ, চাষের ছোটখাটো যন্ত্রপাতিও দিয়েছে। প্রতি বাড়িতে সজনে গাছ লাগিয়েছে, সবজি হিসাবে ওইগুলি খুব ভালো। মাওবাদীরা আরও নানা সবজির বীজ আনছে। সেইসবের চাষ শুরু হলে ওই জায়গা আরও শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে। এখানে কেউ চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে না। পুরোটাই জৈব চাষ।

চাষবাসের পরে পশুপালন। মাওবাদীরা চেষ্টা করছে যাতে জলাধারে হাঁস ছাড়া যায়। আপাতত দেশি মুরগি আর ছাগল এনেছে। গ্রামের লোকে পুষছে। মাওবাদীরা বলেছে, গ্রামে মদ খাওয়া বারণ। আগে অনেকে মদ্যপান করত। এখন খুব বড় উৎসব ছাড়া কেউ মদ্যপান করে না। কিছুদিন বাদে তাও কেউ করবে না। এই হল মাওবাদীদের উন্নয়নমূলক কাজ।

তাদের ধ্বংস করার জন্য তেইশে অক্টোবর রাতে গ্রেহাউন্ড বাহিনী হানা দেয়। আমরা যেভাবে রামগুড়ায় এসেছি, কম্যান্ডোরাও একই পথ ধরে এসেছিল। এছাড়া অন্য রাস্তা নেই। তবে তারা আমাদের মতো বেজিঙ্গি গ্রামের পর থেকে ট্রাকটরে আসেনি। কারণ গ্রেহাউন্ড বাহিনীকে স্থানীয় মানুষ ট্রাকটর ভাড়া দেবে না। তাই ওরা বারো কিলোমিটার পায়ে হেঁটে এসেছে। দিনের বেলায় তাদের জঙ্গলে দেখলে গ্রামবাসীরা জানতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে মাওবাদীরা খবর পেয়ে যেত। রাতের বেলাতেও আশপাশের গ্রামের দু'-একজন তাদের দেখেছে। কিন্তু কম্যান্ডোরা তাদের বন্দুক দেখিয়ে বলেছে, ঘর থেকে বেরলেই গুলি করব। তাই তারা কাউকে খবর দিতে পারেনি।

তবে গ্রামের সকলেই নিশ্চয় মাওবাদীদের সমর্থক নয়। কারণ গ্রেহাউন্ড বাহিনী নিশ্চয় গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকেই কাউকে গাইড নিযুক্ত করেছিল।

রামগুড়া গ্রামের পাশে এক টিলার উপরে ছিল মাওবাদীদের ক্যাম্প। মাওবাদীদের একটি দল দু'-একদিন আগে এসেছিল। তেইশে অক্টোবর রাতে তাদের আরও দু'টি দল আসে। সম্ভবত কোনও গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। যে ভাবেই হোক, গ্রেহাউন্ড বাহিনী মাওবাদীদের মুভমেন্ট সম্পর্কে সব খবর পেয়েছিল। তারা জানত, ওখানে সিপিআই মাওবাদী-র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা আক্কিরাজু হরগোপাল ওরফে রামকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন। গ্রেহাউন্ড বাহিনীর এক কর্তা পরে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মূলত রামকৃষ্ণের খোঁজেই তাঁরা ওইখানে গিয়েছিলেন। অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন আর কে'। যদিও তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বক্তব্য, ওড়িশার ওই অঞ্চলের আশপাশে বক্সাইটের খনি আছে। সেখান থেকে বক্সাইট উত্তোলন করতে হলে আগে আদিবাসীদের ঘরবাড়ি ভেঙে দিতে হবে, বনজঙ্গলও কেটে সাফ করতে হবে। মাওবাদীরা থাকলে তা সম্ভব নয়। তাই গ্রেহাউন্ড লেলিয়ে দিয়েছে। রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য নেতাদের হত্যা করতে পারলে মাওবাদীরা পর্যদুস্ত হবে, সুবিধা হবে খনি মাফিয়াদের।

গ্রেহাউন্ড বাহিনী যখন রামগুড়ার কাছে পৌঁছায়, তখন ভোররাত। মাওবাদীরা ঘুমোচ্ছে। কয়েকজন সেন্ট্রি পাহারায় ছিল। কিন্তু তারা কিছু বুঝতে পারেনি। গ্রেহাউন্ডরা প্রথমে ভি ফর্মেশনে ওই টিলার তিনদিকের জঙ্গল ঘিরে ফেলে। তারপর ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। গ্রেহাউন্ড বাহিনী ঠিক কীভাবে অপারেশন চালিয়েছিল বুঝতে হলে ওখানকার ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। ওই অঞ্চলে ভূমি অসমতল, পরপর অনেক ছোট ছোট পাহাড়, ওইসব বোন্ডা পর্বতমালার অংশ। মাওবাদীরা যে টিলার উপরে ছিল তার তিনদিকে অদূরেই আরও অনেক টিলা। সেইসব জায়গা অরণ্যে ঢাকা। কিন্তু ক্যাম্পের একদিকে টিলা থেকে নামলেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানটা ঘাসে ঢাকা। তার দৈর্ঘ্য প্রায় পঞ্চাশ মিটার, প্রস্থে পঁচিশ-তিরিশ মিটার। তার পরে অন্য টিলায় উঠতে হয়। ওই ফাঁকা জায়গাটা মাওবাদী এবং গ্রেহাউন্ড উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। কারণ ওইখানে গাছের আড়াল নেই। ওইখান দিয়ে যেতে হলে শত্রু সহজেই বনের মধ্যে থেকে তাকে গুলি চালাতে পারবে।

তেইশে অক্টোবর রাতে গ্রেহাউন্ড বাহিনী টিলার তিনদিকের জঙ্গলে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ওই ফাঁকা জায়গাটায় যায়নি। তারা ভেবেছিল, তিনদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে মাওবাদীরা ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। তখন তাদের লক্ষ্য করে কার্বাইন থেকে ব্রাশ ফায়ার করবে।

গ্রেহাউন্ড বাহিনী রাতে আক্রমণ করেনি কেন্না আসলে তারা ভেবেছিল, তাহলে অন্ধকারের সুযোগে অনেক মাওবাদী পালাবে। গ্রেহাউন্ডেরও ক্ষয়ক্ষতি হবে বিস্তর। তাই তারা কয়েক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিল কখন দিনের আলো ফোটে।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, তাঁরা ভোর সাড়ে ছ'টা নাগাদ প্রথমবার গুলির আওয়াজ পান। ওই সময় মাওবাদীরা ঘুম থেকে উঠে পড়েছিল। তাদের রোল কল হচ্ছিল। ক্যাম্পে ওইরকমই নিয়ম। ওই সময় গ্রেহাউন্ড বাহিনী আক্রমণ শুরু করে।

গ্রামের মানুষজন পুরো দেড়ঘণ্টা ধরে টানা গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। কয়েকজন দেখতে যাচ্ছিল ব্যাপার কী, কম্যান্ডোরা বন্দুক উঁচিয়ে বলল, ঘর থেকে বেরলেই গুলি! গ্রামের দু'-একজন মৎস্যজীবী বালিমেলা জলাধারে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য করেও গ্রেহাউন্ড গুলি চালায়।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে সকলে হেলিকপ্টারের শব্দ পেল। জলাধারের পাশে ধানক্ষেতে দু'টি হেলিকপ্টার নেমেছে। গ্রেহাউন্ড বাহিনীর আরও কম্যান্ডো আসছে। মোট চারবার হেলিকপ্টারগুলো ওঠানামা করল। প্রতিবার তারা কম্যান্ডোদের নিয়ে এসেছে।

গ্রামবাসীরা কেউ ঘর থেকে বেরতে পারছে না। এমনকী বাইরে শৌচে যেতেও ভয় পাচ্ছে। গ্রামে গিজগিজ করছে কম্যান্ডোর দল। রাতদিন তাদের টহল। রোজ গ্রামের শস্যক্ষেত্রে হেলিকপ্টার নামছে। কম্যান্ডোদের জন্য গুলি-বারুদ ও খাবারদাবার নিয়ে আসছে। হেলিকপ্টারের দাপটে শস্যক্ষেত্র তছনছ।

ছাব্বিশ তারিখে ফের গুলির আওয়াজ। খানিক বাদে লোকে ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল, কম্যান্ডোরা একটা মেয়ের দেহ পশুর মতো ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পরে জানা যায় সে মাওবাদী স্কোয়াডের সদস্য ছিল। চব্বিশে অক্টোবর ভোরে পালানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রামের পাশে এক নালার মধ্যে লুকিয়েছিল দু'দিন। ছাব্বিশ তারিখ টহল দেওয়ার সময় কম্যান্ডোরা ওই নালায় কিছু একটা নড়তে দেখে। তারা কালবিলম্ব না করে গুলি চালায়। মেয়েটির দেহ একেবারে ঝাঁঝরা। মৃতদেহটি হেলিকপ্টারে করে নিয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা পরে জানতে পেরেছেন, মেয়েটির নাম শ্রীমতী চালুকা। বয়স উনিশ।

আটাশ তারিখে আবার গুলির আওয়াজ। আরও দু'জন মাওবাদী যুবক গ্রামের আশপাশে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। কম্যান্ডোরা তাদের ঝাঁঝরা করে

দিল। পরে জানা গেছে, তাদের নাম গৌতম ও নরেশ। তাদেরও দেহও হেলিকপ্টারে করে নিয়ে গেছে। একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত কম্যান্ডোরা গ্রামে ছিল। তারপর চলে গেছে। হেলিকপ্টার নেমে যাদের ফসল নষ্ট হয়েছে, তাদের পরিবার পিছু দিয়ে গেছে দেড় হাজার টাকা। যে সব হেলিকপ্টারে গ্রেহাউন্ডদের এনেছিল, তাতে করেই নিয়ে গেছে মাওবাদীদের দেহগুলি। তারপর মালকানগিরি থানায় ডেডবডিগুলো সাজানো ছিল। মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের স্মারক।

তারপর স্থানীয় মানুষ একে একে ঘর ছেড়ে বেরতে শুরু করল। আস্তে আস্তে ভয়ের বাতাবরণ কাটছে। কিছুদিন পরে ফের মাওবাদীরাও ওই অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করল। আগের মতোই এখনও গ্রামগুলো তাদেরই দখলে।

আমরা রামগুড়া গ্রামে যাওয়ার খানিক পরে মাওবাদীরা হাজির হল। তিন-চারজনের একটি স্কোয়াড। জলপাই রংয়ের ইউনিফর্ম নেই, একেবারে সাধারণ পোশাক। তাদের নেতার হাতে কার্বাইন। নেহাৎ কমবয়সী ছেলে, বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে বলল, আমার নাম সুধীর। তার সঙ্গে হিন্দিতেই কথাবার্তা হচ্ছে। আমার হিন্দির দৌড় বেশিদূর নয়। আমি তাকে একটা প্রশ্ন করতে গিয়ে আটকে গেলাম। উপযুক্ত শব্দটা কিছুতেই মনে পড়ছে না। সে আমাদের অবাক করে বলে উঠল, বাংলায় বলুন না, আমি বুঝতে পারব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি বাঙাল্লি সে বলল, আমার জন্ম এখানেই, তবে আমার পূর্বপুরুষ বাংলায় থাকতেন। উদ্বাস্তু হয়ে এখানে চলে আসেন।

আমি যতদূর জানি, সাতচল্লিশে দেশভাগের পরে বিধান রায়ের সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের অনেককে দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেয়। মূলত নিম্নবর্ণের লোকজনকেই অরণ্যে যেতে বাধ্য করেছিল। পরে তাদের অনেকে আটাত্তর সালে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসে। তারা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিতে নিজেদের কলোনিও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ঊনসত্তরে পুলিশ ও সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী তাদের অনেককে হত্যা করে। মরিচঝাঁপি দ্বীপ খালি করে দেয়। যদিও প্রথম থেকেই সিপিআই এবং সিপিএম বলত, ক্ষমতায় এলে আমরা দণ্ডকারণ্য থেকে উদ্বাস্তুদের এরাজ্যে ফিরিয়ে আনব। সেই কথায় বিশ্বাস করে উদ্বাস্তুরা অনেকে প্রাণ হারিয়েছিল।

সুধীরের পরিবারও মরিচঝাঁপিতে এসেছিল কিনা আমাদের জানা নেই। তবে একটা কথা বোঝা গেল, সে ভালো বাংলা জানে। আমাদের সঙ্গে একটি সংবাদপত্রের চিত্রসাংবাদিক ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলাম, তাই শুনে বুঝেছে আমি বাঙালি।

সুধীরের স্কোয়াডের তিনটি ছেলে আমাদের বলল, চলুন যেখানে আমাদের ক্যাম্প ছিল সেখানে নিয়ে যাই। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন গ্রামবাসীও গেল। মনে হয় তারা মাওবাদীদের ঘনিষ্ঠ।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, পায়ে চলা পথও নেই। প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু টিলার ঢাল বেয়ে ওঠা। মিনিট পনের পরে আমরা অকুস্থলে পৌঁছেছি।

চারপাশে ছড়িয়ে আছে স্টিলের থালা, আমরা গুনলাম, মোট তিরিশটি। বাইশটি ছাতা পড়ে আছে, তাদের কাপড়গুলো পুড়ে গেছে। কম্যান্ডোরা ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। অনেকগুলো পোড়া জামাকাপড় পড়ে আছে। সেফটি রেজার, সাবান আছে, কাঁচা আনাজ, পটল, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, মশলাপাতি, রান্না করা ভাতও ছড়িয়ে আছে খানিকটা জায়গা জুড়ে। কয়েকটা ট্যাবলেটের স্ট্রিপ আছে, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, টিফিন বাক্স, জলের বোতল, এসবও আছে। আশপাশে গাছের গুঁড়িতে কয়েকটি গুলির দাগ। আমরা গুনলাম, মোট সাতটি।

রামগুড়ায় পৌঁছানোর পর বেলা এগারটা নাগাদ আমরা ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। ফিরে গ্রামেই খাওয়াদাওয়া হল। অনেকগুলো ঘরের মধ্যিখানে উঠোন, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া। স্টিলের থালায় ভাত, সঙ্গে একটা হলুদ রংয়ের তরল, অনেকটা ডালের মতো দেখতে, কিন্তু ডাল নয়, সম্ভবত স্থানীয় খাবার। জলের মধ্যে পিঁয়াজ-রসুন দিয়ে ফোড়ন দেওয়া, তাতে হলুদও দিয়েছে। তার সঙ্গে বেগুনের ভর্তা, নুন আর কাঁচালংকা দিয়ে মাখা।

বিকালে সুধীর ফের আমাদের অকুস্থল ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে গেল। প্রথমে দেখাল সেই নালা, যেখানে শ্রীমতী চালুকা মারা গেছে। তারপর নিয়ে গেল ক্যাম্পে। সে আমাদের ব্যাখ্যা করে বলল, চব্বিশে অক্টোবর ভোরে কম্যান্ডোদের গুলির শব্দ পেয়েই সবাই সতর্ক হয়। প্রথমদিকে পালটা গুলি চালিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছিল। মাওবাদীদের গুলিতে একজন কম্যান্ডো মারাও পড়ল। কিন্তু বাকিরা তখনও সুরক্ষিত। তখন বোঝা গেল এভাবে পালটা গুলি চালিয়ে লাভ নেই। কম্যান্ডোরা অতি সুরক্ষিত জায়গায় পজিশন নিয়েছে। তখন সবাই স্থির করল, যে করেই হোক রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য নেতাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে হবে। তাঁদের কোনও রকমে টিলার সামনে ফাঁকা জায়গাটা পার করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। অরণ্যে একবার ঢুকে গেলে কেউ খুঁজে পাবে না।

সেইমতো মাওবাদী ক্যাডাররা সেই ফাঁকা জায়গায় সবাই মিলে জড়ো হয়ে গুলি চালাতে লাগল। তারা নিজেরা তখন অরক্ষিত। কম্যান্ডোদের গুলিতে মারা পড়ল আটাশ জন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সফল। এই গুলিবিনিময়ের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় নেতারা নিরাপদে বেরিয়ে গেছেন। মাওবাদীরা তাঁদের আড়াল করার জন্য মানব প্রাচীর গড়েছিল। সেই প্রাচীর ভেদ করা গ্রেহাউন্ডের সাধ্যের বাইরে।

সুধীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অরণ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রাতে গ্রামে ফিরে ফের ভাত আর বেগুনের ভর্তা। তারপর কুটিরের দুয়ারে শুয়ে ঘুম। পরদিন বালিমেলা জলাশয়ে স্নান। তারপর ভাত, সয়াবিনের তরকারি, বেগুনের ঝোল আর দু'টো ডিম সেদ্ধ দিয়ে মহাভোজ। তখন বেলা দশটা। এইবার নৌকায় যেতে হবে। আমাদের জন্য বালিমেলা জলাধারে যন্ত্রচালিত নৌকা রেডি। নৌকায় চড়ে পনের মিনিটের যাত্রা। চারধার ভারী সুন্দর, জলের মধ্যে মধ্যে পাহাড়, চারপাশেও অরণ্যময় পার্বত্য অঞ্চল।

নৌকা আমাদের নামিয়ে দিল রামগুড়া থেকে খানিক দূরে। তখন বুঝলাম, গতকাল যতদূর হেঁটে এসেছি, আজ সেই পথটা নৌকায় পৌঁছে দিল। নৌকা ঘাট থেকে খানিক দূরে ট্রাকটর দাঁড়িয়ে আছে। তাতে চড়ে একটা গ্রামে যাওয়া গেল, তার নাম অন্দ্রপল্লী। সেখানে একটা সরকারি বিদ্যালয় আছে। স্কুলঘরে মাওবাদীরা মিটিং ডেকেছে। গ্রামের সবাই আসবে। খানিক বাদে শ'তিনেক লোক জড়ো হল, গ্রামের যত পুরুষ-মহিলা সবাই আছে।

প্রথমে স্থানীয় এক যুবক বলতে উঠল। সে ভালো বক্তা নয়, মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলে। তবুও থেমে থেমে যা বলল, তার মূল কথা,

পুলিশ যদি মাওবাদীদের হত্যা করে, তা হলে আমাদের উন্নয়নের জন্য কে কাজ করবে? সরকার কি আমাদের চাষবাসের ব্যবস্থা করবে, ওষুধ দেবে, ছেলেপুলেদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে?

তারপরে অনেকে চব্বিশে অক্টোবরের ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল। একজন বলল, ওইদিন গুলি চলার সময় এক মাওবাদী গ্রামের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কম্যান্ডোরা জানতে পেরে বেপরোয়া গুলি চালায়। গ্রামে অতজন মারা গেল, কিন্তু অসামরিক প্রশাসনের কেউ একবার খোঁজও নিতে এল না যে কী হয়েছে।

আর একজন বলল, আমি মাছ ধরছিলাম, আমার দিকে গুলি চালিয়েছে। ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। আমি তো মাওবাদী নই। আমাকে কেন গুলি করল?

অন্দ্রপল্লী গ্রামে মিটিং শেষ হল একটা পঁয়ত্রিশে। তারপরে চা খাওয়াল। চায়ে দুধ মেশানো। গ্রামে গরু দেখেছি, তারই দুধ নিশ্চয়। চা পানের দশ মিনিট বাদে আমরা ফের রওনা হলাম।

কুড়ি-পঁচিশ মিনিট গিয়ে আর একটা গ্রাম, তার নাম গুড়াশেশু। গ্রামের পথে চারমাথার মোড়ে এক শহিদ বেদি, প্রায় পনের ফুট উঁচু, লাল রং করা। তাতে তেলুগু ভাষায় পাঁচ শহিদের নাম লেখা। শহিদ বেদি কয়েক বছরের পুরানো। অর্থাৎ আগেও সেখানে পুলিশি অভিযান হয়েছে। সেখানে প্রায় পাঁচশজন জড়ো হয়েছে। গ্রেহাউন্ডের গুলিতে যারা মারা গেছে, তাদের পরিবারের লোকেরাও আছে। তাদের অনেকে বলল, আমাদের ছেলেরা মাওবাদীদের দলে ছিল না, কিন্তু তাও মরতে হল। একজন বলল, গ্রেহাউন্ডরা এক যুবককে গুলি করে গলা কেটে নিয়েছে। তার বয়স আঠারো।

অনেকে বলছে, মৃত গ্রামবাসীদের দেহ আনতে গিয়েও অনেক হেনস্তা হচ্ছে। পুলিশ বলছে, টাকা দে তবে বডি ছাড়ব। এক মৃত কিশোরীর বাবা বললেন, আমাদের এলাকায় কেউ কখনও হেলিকপ্টার চড়েনি। আমার মেয়ে মরার পরে সরকার তাকে হেলিকপ্টার চড়াল।

মেয়ে মারা গেছে বলে তিনি নিশ্চয় শোক পেয়েছেন, কিন্তু গর্বও আছে। আমার মেয়ে তো কোনও খারাপ কাজ করতে যায়নি। ভালো কাজ করতে গিয়েই মরেছে।

ওই লোকটির কথা শুনে আমাদের কাশ্মীরের কথা মনে পড়ল, বুরহানউদ্দিন রব্বানির মৃত্যুর আগেই তার বাবা বলতেন, আমার ছেলের মরার সময় হয়ে গেছে। ছেলেকে নিয়ে একপ্রকার গর্ব ছিল তাঁরও।

দুটো মিটিংয়েই অনেকে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করল। তারা বলছে, ওদের দাপটে আমাদের জীবনধারণ করাই মুশকিল। অনেকসময় আমরা হাটে গেলে তারা পাকড়াও করে। আমরা কী কেনাকাটা করেছি দেখতে চায়।

ওদের সঙ্গে কথোপকথন চলল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। তারপর স্থানীয় লোক আমাদের চা খাওয়াল, সঙ্গে ভালো ব্র্যান্ডের বিস্কুট। বিস্কুট পাওয়া যায় বেজিঙ্গি গ্রামে। অথবা কেউ হায়দরাবাদ থেকে এনেছে। চায়ের পরে অল্প নুন দিয়ে সুজি সেদ্ধ, তার সঙ্গে টম্যাটো। তাও নুন দিয়ে সেদ্ধ করেছে। স্টিলের থালায় প্রথমে সুজি ঢেলে দিচ্ছে, তারপরে টম্যাটো।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে কম্যান্ডো জিপ হাজির। এবার ফেরার পালা। সেই জিপেই বিশাখাপত্তনম। চারটেয় রওনা হয়েছি, বিশাখাপত্তনমে পৌঁছতে বেজেছে সাড়ে বারোটা। রাত দশটা নাগাদ এক জায়গায় জিপ থেমেছিল, পথের ধারে একটা চায়ের দোকান, মিষ্টিও পাওয়া যায়। সেখানে দেখি আরও দু'টি জিপ থেমেছে। তাতে চড়ে চলেছে ছাত্রদের দল। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে, দেশের নানা প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তারা। মালকানগিরিতে আরও দু'টি জায়গায় এনকাউন্টার হয়েছে, তারা তথ্যানুসন্ধানে যাবে। সেই দলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে আছে, তারা আমাদের চেনা। একজন হেসে হাত নেড়ে বলল, এগার তারিখে কলকাতায় একটা মিছিল আছে, মালকানগিরি আর ভোপালের গণহত্যা নিয়ে, আপনারা আসছেন তো?

বিশাখাপত্তনমে ফিরে জনৈক তেলুগু লেখকের বাড়িতে রাতে থাকার ব্যবস্থা। সেখানে আমাদের অপর একটি টিমও হাজির। তারা মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। সেই রাতে অন্ধ্রের মানবাধিকারকর্মীরা প্রেস রিলিজ লিখছেন। তেলুগু ভাষায় লেখা। পরে ইংরেজিতেও অনুবাদ করবেন।

পরদিন বিকালে সাংবাদিক বৈঠক। স্থানীয় এক গ্রন্থাগারে নিয়ে গেল। বেশ বড় বিল্ডিং, বাইরেও অনেকখানি জায়গা, সেখানে বসে ছেলেমেয়েরা নানা বই থেকে নোট নিচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক শুরু চারটেয়। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন সাংবাদিক এসেছেন। প্রথমে বললেন প্রফেসর শেষাইয়া। তেলুগুতে বলছেন, কিছু বুঝতে পারছি না, কিন্তু তাঁর বলার দৃপ্ত ভঙ্গিমা চোখ এড়ায় না।

সাংবাদিক বৈঠকে পুরো সময় থাকার অবকাশ নেই, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দেবে। এমনিতেই ফিরতে দু'দিন দেরি হচ্ছে। কথা ছিল, ছয় তারিখেই বাড়ির পথে রওনা হব। কিন্তু দুর্যোগের জন্য দেরি হয়ে গেল। আমরা রামগুড়াতেই পৌঁছলাম ছয় তারিখে। ফিরছি আট তারিখে। কিন্তু ছয় তারিখে বিশাখাপত্তনমে পৌঁছে গিয়েছে ভানু সরকার। সে মানবাধিকার কর্মীদের অপর টিমটির সঙ্গে ছিল। তাদের কাজ শেষ হয়েছে আগেই। সে ছ'তারিখে বিকালে তাপসবাবুকে ফোন করে জানিয়েছিল, আমাদের ফেরার টিকিটগুলো ক্যানসেল করে দিন।

আমরা, যারা রামগুড়ায় গিয়েছি, তাদের পক্ষে তাপসবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। মোবাইলের টাওয়ারই নেই। ভানু বিশাখাপত্তনমে পৌঁছতে তার মোবাইল সচল। অমনি সে ফোন করেছে কলকাতায়। কিন্তু তাপসবাবু তখন ট্রেনে, অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। তখন আর টিকিট ক্যানসেল করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরদিন আট তারিখের টিকিট করে আমাদের মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন।

বিকালে ট্রেন। সপ্তাহে একবার বিশাখাপত্তনম থেকে একটি ট্রেন হাওড়ার শালিমারে আসে, তাতে আমাদের ফেরার বন্দোবস্ত।

মালকানগিরিতে যাওয়ার সময় যেমন, ফেরার সময়েও তাপসবাবু মুশকিল আসানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যদিও এই লেখা পত্রিকার দপ্তরে জমা দেওয়ার সময় পর্যন্ত তাঁকে ধন্যবাদও জানানো হয়নি।

সংযোজন: আমাদের যে বন্ধুরা মৃতদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পেরেছি সিডিআরও-র প্রেস রিলিজ পড়ে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করে দিলাম।

মানবাধিকারকর্মীদের একটি টিম মালকানগিরিতে নিহত শ্যামলা পাঙ্গি, সোনা দাস্যা কুমুলু, খিল্লো জয়রাম, সিন্ধে খিল্লো, ভুমলি, অমলা,

মালকুম, লাকসা মুদালি এবং কাবেরী মুদালির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে। সিন্ধে খিল্লোর বাবা বলেন, গত রবিবার তিনি মেয়ের সঙ্গে হাটে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁর মেয়ে মাওবাদীদের মিটিংয়ে যায়। তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। পরদিন ভোরে তিনি গুলির শব্দ শোনেন। তখনই মেয়ের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা শুরু হয়। সোমবার যখন সে ফিরল না, পরদিন তিনি তাকে খুঁজতে বেরন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন গ্রামবাসী ছিলেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মালকানগিরি শহরে গিয়ে তিনি শোনেন মেয়ে মারা গেছে। তার দেহের ময়না তদন্তও হয়ে গেছে। তিনি নিজের খরচে মেয়ের দেহ গ্রামে নিয়ে আসেন।

নিহত জয়রাম খিল্লোর বয়স ছিল ষোল। সে খেজুরিগুড়া গ্রামে থাকত। তাকে কট্টর মাওবাদী বলে গুলি করে মেরেছে। নিহত সোনা দাস্যা কমলার বয়স ছিল বত্রিশ। সে বিবাহিত, তিনটি সন্তানও আছে। পরিবারের আরও কয়েকজনকে নিয়ে সে মাওবাদীদের মিটিংয়ে যায়। যাওয়ার আগে মাকে বলে গিয়েছিল, সোমবার রাতের মধ্যে ফিরবে। কিন্তু পরদিনও যখন সে ফিরল না, তখন বাড়ির অন্যান্য লোকজন তাকে খুঁজতে বেরল। তারও দেহের খোঁজ মিলল মালকানগিরিতে, তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে মেরেছে। চোদ্দ বছরের শ্যামলা পাঙ্গিও গুলির আঘাতে মারা গেছে। মৃত জয়রাম খিল্লোর বুকের বাঁদিকে গুলি লেগেছিল। খেজুরিগুড়ার লিকোনা গোল্লারি নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গেও তদন্তকারীরা দেখা করেন। তিনি স্বামীর খোঁজে মালকানগিরি থানায় গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেন, তাঁর স্বামীকে পুলিশ জিপ থেকে নামাচ্ছে। তিনি পুলিশকর্তাদের কাছে আবেদন করেন, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। তারা বলে, তোর স্বামী তো বেঁচে আছে, আর কী চাস!

সরকারের বক্তব্য: তথ্যানুসন্ধানীরা মালকানগিরির পুলিশ সুপার (রুরাল)-এর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি প্রথমে বললেন, মাওবাদীরা সত্যিই ওই অঞ্চলে ছিল কিনা তিনি জানতেন না। তবে কানাঘুষো শুনেছিলেন, ওখানে তাদের প্লেনারি মিটিং হতে পারে। পরক্ষণেই তিনি নিজের বক্তব্য সংশোধন করে বলেন, তাঁর কাছে নির্দিষ্ট খবর ছিল ওখানে মাওবাদীরা আছে এবং ওড়িশা পুলিশ অন্ধ্রের গ্রে হাউন্ডের সাহায্য চেয়েছিল। তাদের দেখে প্রথমে মাওবাদীরাই গুলি চালায়। গ্রেহাউন্ড বাহিনী আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে মাত্র।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দু'হাজার আট সালে বালিমেলা জলাধারে নৌকা চালিয়ে গ্রেহাউন্ডরা ওই অঞ্চলে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল। তখন মাওবাদীদের গুলিতে তাদের আটত্রিশ জন মারা যায়। এতদিন বাদে তারা ওই ঘটনার শোধ নিল।

এখানে স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক নিয়মগুলি মানতে হয়, তা মানছে না। যেভাবে ছাব্বিশ ও আটাশ তারিখে তিন নিরস্ত্র ও আহত মাওবাদীকে হত্যা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ যুদ্ধের রীতিবহির্ভূত।

তথ্যানুসন্ধানী দল লক্ষ্য করেছে, মালকানগিরির দুর্গম অঞ্চলে তিন দিন ধরে ধারাবাহিক গণহত্যা চালিয়েছে পুলিশ। তারা মাওবাদী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের হত্যা করার জন্য গিয়েছিল। কাউকে জীবন্ত ধরতে চায়নি। মৃতদের বুকে, পেটে, কাঁধে গুলির দাগ দেখে বোঝা যায়, খুব কাছ থেকে গুলি করেছিল। তার আগে অনেকের ওপর অত্যাচারও করেছে। তাদের শরীরের নানা অঙ্গ কেটে নিয়েছে। একজনের মুণ্ডও কেটে নিয়েছে। এতে পুলিশের হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে সরকারের নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশন মন্তব্য করেছে, নিছক বলপ্রয়োগে মাওবাদী সমস্যা সমাধান হওয়ার নয়। কারণ তা মূলত আর্থ-সামাজিক সমস্যা। যদিও সরকার শক্তিপ্রয়োগ করেই মাওবাদীদের দমন করতে চায়। আমরা মনে করি, আমাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষকে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হয়েছে।

আমাদের দাবি: সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতিকে দিয়ে মালকানগিরির ঘটনার তদন্ত করাতে হবে। ওই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের ওপর নির্যাতন নিবারণ আইনে ফৌজদারি মামলা করতে হবে। অবিলম্বে গ্রেহাউন্ড বাহিনী ভেঙে দিতে হবে। তথাকথিত উপদ্রুত এলাকা থেকে আধা সেনা সরাতে হবে। সেখানে বন অধিকার আইন এবং পঞ্চায়েত রাজ ও তফসিলভুক্ত এলাকা আইন কার্যকর করতে হবে। সরকারকে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে দশ লক্ষ টাকা করে।

পুনশ্চ: গত এগারই নভেম্বর কাগজে পড়লাম, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র ও ছত্তিশগড় সরকারকে বলেছে, মাওবাদী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে যত্নবান হোন। মানবাধিকার কর্মীরা এতদিন নিরলসভাবে আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, আর্থ সামাজিক কারণেই নকশালপন্থার উদ্ভব। অস্ত্র দিয়ে তার সমাধান করতে যাওয়া ভুল। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টও তাঁদের মত মেনে নিল মনে হয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের কথা শুনে সরকার সত্যিই মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে, এমন আশা না করাই ভালো।

যে সব মানবাধিকারকর্মী তথ্যানুসন্ধানে গিয়েছিলেন, তাঁদের ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নাম দেওয়া হল:

আর এন পাল (ডিএসও, পাঞ্জাব), প্রীতপাল সিং (এএফডিআর, পাঞ্জাব), লেনিন (নিশান, জনবাদী, ওড়িশা), প্রভাত সিংহ রায় (এপিডিআর, পশ্চিমবঙ্গ), গোপাল (সিপিডিআর, তামিলনাড়ু), রাজা (সিপিসিএল, তামিলনাড়ু), আর জেশু (ওপিডিআর, অন্ধ্রপ্রদেশ), নরেন্দ্র মোহান্তি (কমিটি এগেনস্ট ফেব্রিকেটেড কেসেস, ওড়িশা), ছোটন দাস (বন্দিমুক্তি কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ), অরুণ কুমার (সাংবাদিক), বলবন্ত সিং (এএফডিআর, পাঞ্জাব), অ্যাডভোকেট গুরুনাথন (সিপিডিআর, তামিলনাড়ু), অ্যাডভোকেট মুরুগেশন (সিপিসিএল, তামিলনাড়ু), হনুমন্ত রাও (ওপিডিআর, অন্ধ্রপ্রদেশ), লক্ষ্মণ (টিএস, সিএলসি), নারায়ণ রাও ((টিএস, সিএলসি), চিতুবাবু (এপিসিএলসি), চন্দ্রশেখর (এপিসিএলসি), এস শেষাইয়া (সিএলসি), কে পি সুব্বারাও (সিএলসি), কুমারস্বামী (টিএস, সিএলসি), ভি রঘুনাথ (টিএস, সিএলসি), এন পুরুষোত্তম (টিএস, সিএলসি), রঘুরাম (এপিসিএলসি), জি শিবরামকৃষ্ণ রেড্ডি (অ্যাডভোকেট), ই বেংকটাশ্বরুলু (এপিসিএলসি), প্রিন্সিপাল রাজশেখর, সোমাইয়া (এপিসিএলসি), ভি ভি বালকৃষ্ণ (সিআরপিপি), জে সূর্যনারায়ণ (এপিসিএলসি), বিশাই দামোদর তিলক (ওপিটিসিআর)।